সংবাদ

তারিখ 13 SEP 2009
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৬

জীবনমান উন্নয়নে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা

শাওয়াল খান

(গতকালের পর)

১৮৮২ সালে স্যার উইলিয়াম হান্টারের নেতৃত্বে ভারতীয় শিক্ষা কমিশন একটি রিপোর্ট প্রণয়ন করে। তাতে প্রতিটি জেলায় ও পৌর এলাকায় স্কুল বোর্ড প্রতিষ্ঠারও সুপারিশ করা হয়। এই রিপোর্টে নৈশ বিদ্যালয়ের ধারণা পাওয়া যায়। ১৯১৬ সালে প্রশাসনিক সংস্কারের ফলে ১৯২০ সালে নির্বাচিত ভারতীয় মন্ত্রীদের হাতে প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব অর্পিত হয়। ১৯২৬ সালে প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার জন্য বঙ্গদেশে ব্যাপক আন্দোলন শুরু হয়। অথচ গোপাল কৃষ্ণ গোখলে ১৯১০ সালে এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় আইন সভায় প্রস্তাব এনেছিলেন। তখন অবিভক্ত বাংলাদেশে ৯২৬টি নৈশ বিদ্যালয় এবং ১৪০টি বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র ছিল। সমবায়ের মাধ্যমে এই স্কুলগুলো পরিচালিত হতো। প্রাথমিক শিক্ষা আইন গ্রামাঞ্চলের জন্য পাস হয় ১৯৩০ সালে, যা শহরাঞ্চলের গৃহীত হয় ১৯১৯ সালে।

১৯৩৫-৩৬ সালে খান বাহাদুর আহছানউল্লাহ, হাফেজ মোহাম্মদ ইসহাক প্রমুখ দেশে বয়স্ক শিক্ষা প্রসারের প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ১৯৩৮ সালে বঙ্গদেশে সাক্ষরতা আন্দোলন গড়ে উঠে। ড. ফ্রাঙ্ক লাওবাক প্রবর্তিত শিক্ষা পদ্ধতি 'একজন প্রতিজন শিক্ষা' (Each one Teach one) ছিল এই আন্দোলনের মূল স্লোগান। জনগণের মাধ্যমে বিপুল সাড়া জাগানোর কারণে প্রাদেশিক সরকার ১৯৩৯ সালে নবগঠিত বেঙ্গল রুরাল রিকনস্ট্রাকশন ডিপার্টমেন্টের হাতে বয়স্ক শিক্ষার দায়িত্ব অর্পণ করে। তাদের শিক্ষাক্রমে তখন সাক্ষরতা ছাড়াও কৃষি, পশুপালন ও পয়ঃনিষ্কাশন বিষয়ও অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। ১৯৪৪ সালে সার্জেন্ট কমিটির যুদ্ধোত্তর শিক্ষার পুনর্গঠন বিষয়ক রিপোর্টে ৬-১৪ বছর বয়সের সব ছেলে মেয়ের জন্য সর্বজনীন, অবৈতনিক, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের সুপারিশ করা হয়। এতে আরও বলা হয়, ৩-৬ বছর বয়সীদের জন্য প্রাক-প্রাথমিক, ৬-১১ বছর বয়সীদের জন্য নিম্ন প্রাথমিক ও ১১-১৪বছর বয়সীদের জন্য উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হবে। তবে এ সমস্ত প্রস্তাব বাস্তবায়নের জন্য সময় ধরা হয় ৪০ বছর।

২. পাকিস্তান পর্ব : ১৯৪৭-১৯৭১

১৯৪৭ সালে করাচিতে জাতীয় শিক্ষা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় ৬-১১ বছরের শিশুদের জন্য শিক্ষা সর্বজনীন, বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক হবে; বয়সের উচ্চসীমা ক্রমে ১৪তে উন্নীত করা হয়। ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারিতে পূর্ব পাকিস্তান ভাষা আন্দোলন চূড়ান্ত রূপ ধারণ করে। সারাদেশে প্রাথমিক শিক্ষার মেয়াদ ৪ বছর থেকে ৫ বছর করা হয়। প্রথম পাঁচশালা পরিকল্পনায় (৫৫-৬০) প্রাথমিক শিক্ষা সর্বজনীন করা হয়। ১৯৫৩ সলে নিরক্ষরতা দূরীকরণে প্রথম জাতীয় V-AID উদ্যোগ চালু হয়। ১৯৫৬ সালে এইচজিএস বিভাগ কর্তৃক ইস্ট পাকিস্তান অ্যাডাল্ট এডুকেশন কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ গঠিত হয়। লাওবাক পদ্ধতি অনুসরণ করে বিভার একটি প্রাইমার ও চার্ট তৈরি করেন।

১৯৫৯ সালে পাকিস্তানের প্রথম জাতীয় শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। রিপোর্টে ১০ বছরের মধ্যে ৫ বছর মেয়াদি প্রাথমিক শিক্ষা সর্বজনীন ও বাধ্যতামূলক করার কথা বলা হয়; একে ১৫ বছরের মধ্যে ৮ বছর মেয়াদি করা হবে। ১৯৬১ সালে V-AID কার্যক্রম বন্ধ করে দেয়া হয়। দ্বিতীয় (৬০-৬৫) ও তৃতীয় (৬৫-৭০) পরিকল্পনায় প্রাথমিক শিক্ষার বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়; লক্ষ্য প্রাথমিক স্তরে ভর্তি ৪৫%ে থেকে ৭০%-এ বাড়ানো। শিক্ষা পরিদপ্তরের আওতায় কুমিল্লায় বয়স্ক শিক্ষা শাখা প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৬৩ সালে। ১৯৬৪ সালে এই শাখা কুমিল্লার ৪টি থানায় সম্প্রসারণ করা হয়। ১৯৬৯-এর মাঝামাঝি পর্যন্ত বয়স্ক শিক্ষা শাখার আওতায় ৪০ হাজার সাক্ষর নারী-পুরুষকে সনদ প্রদান করা হয়েছে। এই শাখা ৩টি শিক্ষার্থী বই, ২টি হিসাবের বই এবং ৫৭টি অনুসারক বই রচনা করেছে। BARD -এর উদ্যোগে মসজিদভিত্তিক শিশু ও বয়স্ক শিক্ষার কার্যক্রম চালু হয়। এই কার্যক্রমের আওতায় অনুসারক শিক্ষার জন্য ভ্রাম্যমাণ পাঠাগার ও সাপ্তাহিক জানা অজানা পত্রিকা প্রকাশিত হয়।

৩. বাংলাদেশ পর্ব : ১৯৭১ খ্রিঃ থেকে বর্তমান

১৯৭১ সালে কুড়িগ্রামের রৌমারী থানায় 'বাংলাদেশ বয়স্ক সাক্ষরতা সংসদ' বয়স্ক শিক্ষা অভিযান চালু করে। ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ জাতীয় সমবায় ইউনিয়ন দেশের ৫২টি থানায় গণশিক্ষা অভিযান গড়ে তোলে। ব্র্যাক, স্বনির্ভর বাংলাদেশ, জাতীয় তরুণ সংঘ প্রভৃতি বেসরকারি সংস্থা সাক্ষরতা কর্মসূচি হাতে নেয়। ১৯৭৩ সালে গ্রাম উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের পক্ষে 'বাংলাদেশ জাতীয় সমবায় ইউনিয়ন প্রথম ৫ বছর মেয়াদি একটি প্রকল্প প্রস্তাব পেশ করে। এরা ২ মাসের গণশিক্ষার পাঠ্যসূচি ও বই প্রকাশ করে। এছাড়াও শিক্ষা কমিশন কর্তৃক আরও একটি বয়স্ক শিক্ষা প্রকল্প প্রস্তাব পেশ করে। এরা ২ মাসের গণশিক্ষা পাঠ্যসূচি ও বই প্রকাশ করে। এছাড়াও শিক্ষা কমিশন কর্তৃক আরও একটি বয়স্ক শিক্ষা প্রকল্প প্রস্তাব দেয়া হয়। দু'টি প্রকল্পের মধ্যে একটি চালু হলেও তা ১৯৭৪-এ বন্ধ করে দেয়া হয়। সরকার দেশের ৩৬,১৬৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে (১৫৭,৭৪২) জন শিক্ষক ও ৭,৭৫৮,০০০ জন ছাত্রসহ) সরকারিকরণ করে।

১৯৮০-৮২ সালের মধ্যে কুমিল্লা বয়স্ক শিক্ষা শাখাটি ঢাকায় স্থানান্তর করা হয় এবং কেন্দ্রীয় সরকারের আওতায় গণশিক্ষা কার্যক্রম এর আত্তীকরণ করা হয়। সরকারি উদ্যোগে দেশব্যাপী গণশিক্ষা কার্যক্রম চালু করা হয় এবং উপ-রাষ্ট্রপতিকে সভাপতি করে জাতীয় সাক্ষরতা কাউন্সিল গঠন করা হয়। ১৯৮২ সালে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষার্থীদের মাধ্যমে (প্রত্যেক পরীক্ষার্থী) বাধ্যতামূলকভাবে ১ জন নিরক্ষরকে সাক্ষর করার কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়।

১৯৮৮ সালে বাংলাদেশ গণশিক্ষা সংঘ এর তত্ত্বাবধানে স্থানীয় বেসরকারি সংস্থাসমূহের সহযোগিতায় গণশিক্ষা কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়। এই কার্যক্রমের আওতায় প্রায় দশটি তৃণমূল পর্যায়ের বেসরকারি সংস্থা জড়িত ছিল। ১৯৮৭ সালে বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। এবং সরকারের পক্ষ থেকে গণশিক্ষাবিষয়ক বেসরকারি কার্যক্রমসমূহের মধ্যে সমন্বয় করার জন্য 'গণশিক্ষা কার্যক্রম' গ্রহণ করা হয়।

১৯৯০ সালে প্রাথমিক শিক্ষা (বাধ্যতামূলক) আইন প্রণীত হয়। এই বছরই গণসাক্ষরতা অভিযান প্রতিষ্ঠিত হয়। গণসাক্ষরতা অভিযান সাক্ষরতা পরিসরে কর্মরত বেসরকারি উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান ও গণতান্ত্রিক শক্তির একটি ঐক্য প্রতিষ্ঠান।

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা ০১-০১-৯২ থেকে ৬৮টি থানায় প্রবর্তিত হয়। পরে ১৯৯৩ থেকে দেশব্যাপী এই কার্যক্রম শুরু করা হয়। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষাকে জোরদার করার ক্ষেত্রে সহযোগিতার জন্য সরকার সবার জন্য শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় ইউনিসেফের সঙ্গে যৌথভাবে সামাজিক সচেতনায়ন কর্মসূচি গ্রহণ করে। সেই কর্মসূচির অংশ হিসেবে সাধারণ শিক্ষা প্রকল্পের কাজ শুরু হয়।

১৯৯২ সালের সরকারের প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ সৃষ্টি হয়। সাধারণ শিক্ষা প্রকল্পের আওতায় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণ ও সংস্কার, স্যাটেলাইট বিদ্যালয় গঠন, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও সহকারী থানা শিক্ষা অফিসারদের ক্ষমতা বিন্যাস, শিক্ষাক্রম উন্নয়নও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নসহ উপানুষ্ঠানিক বেসরকারি প্রাথমিক ও কৈশোর শিক্ষা কার্যক্রমে অর্থায়ন ইত্যাদি কর্মসূচি রয়েছে। এছাড়াও সরকার সমতাস্থাপক শিক্ষার জন্য উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে।

১৯৯৩ সালের শুরুতে সরকারের 'গণশিক্ষা কার্যক্রম' পুনর্গঠিত হয় এবং সমন্বিত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বিস্তার কার্যক্রম (ইনফেপ) হিসেবে এর পুনঃ নামকরণ হয়। ইউনফেপ তিন বছরের (১৯৯৩-৯৫) একটি 'পাইলট' প্রকল্প হিসেবে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের তত্ত্বাবধানে কাজ শুরু করে। ইতোমধ্যে সবার জন্য শিক্ষার কর্মবিবরণী প্রণীত হয়।

সরকারি সহযোগিতায় অনেক বেসরকারি সংস্থা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষায় সম্পৃক্ত হয় ইনফেপের মাধ্যমে। এ প্রকল্পের আওতায় লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ১.৬৭ মিলিয়ন নিরক্ষরের স্থলে ২.৪৭ মিলিয়ন নিরক্ষরকে সাক্ষরতা সেবা প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্পটি ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত কার্যক্রম পরিচালনা করে সাক্ষরতা ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জনে সক্ষম হয়। এই অভিজ্ঞতা ও সাফল্যের উপর ভিত্তি করে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারে প্রাতমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের অধীনে ১৯৯৫ সালের ৩ সেপ্টেম্বর উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা করা হয়। অধিদপ্তর পরবর্তীকালে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোতে রূপান্তরিত হয়। এই ব্যুরোর মাধ্যমে বর্তমানে মূলত দুই ধরনের কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে, প্রথমত; সাক্ষরতা কর্মসূচি, দ্বিতীয়ত' সাক্ষরতা-উত্তর ও অব্যাহত কর্মসূচি। দেশের ৮ থেকে ৪৫ বছর বয়স ৩৪.১১ মিলিয়ন নিরক্ষর জনগোষ্ঠীকে সাক্ষরতা সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ৫টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করে। এ ৫টি প্রকল্পের মধ্যে ইতোমধ্যে ২টি প্রকল্পের কার্যক্রম সমাপ্ত হয়েছে।

কিছুদিন আগে তৎকালীন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা এবং সংস্কৃতি উপদেষ্টা রাশেদা কে. চৌধুরীর বরাত দিয়ে দৈনিক ইত্তেফাক (১২ ডিসেম্বর ২০০৮) জানায় যে, বাংলাদেশের ১৪ হাজার ১৯৯টি গ্রামে কোন প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই। ফলে কমপক্ষে ১০ লাখ শিশু প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। উপদেষ্টার বরাত দিয়ে পত্রিকাটি আর জানায়, যেসব স্থানে প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই তার মধ্যে ২ হাজার গ্রামে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান করার পরিকল্পনা চলতি অর্থবছরের বাজেটে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে এগুলো বাস্তবায়ন করা হবে। পাশাপাশি এখানে এনজিওগুলোকে এসব গ্রামে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য অনুরোধ করা হবে। যেসব গ্রামে কমপক্ষে ২০০০ বাসিন্দা আছে সেখানে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করার কথা। ২ হাজারেরও বেশি গ্রাম রয়েছে যেখানে জনসংখ্যা ২ হাজারেরও বেশি। সরকার এই ২ হাজার গ্রামে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের পরিচালনা নিয়েছে। বাকি গ্রামে জনসংখ্যা কম হওয়ায় উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম শুরুর পরিকল্পনা করা হয়েছে। সব পিছিয়ে পড়া গ্রামগুলো চরাঞ্চল, চা বাগান, পাহাড়ি এবং আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় অবস্থিত। দেশে ৫৩ হাজার ৮০১টি গ্রামে ৮০ হাজার ৪০০টি বিভিন্ন ধরনের প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৩৭ হাজার ৭৩৫টি। বাকিগুলো সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত এবতেদায়ী মাদ্রাসা।

আমাদের প্রত্যাশা, যেসব স্থানে প্রাথমিক শিক্ষা থেকে শিশু, কিশোর ও বয়স্ক লোক বাদ পড়ছে তাদের শিক্ষ নিশ্চিতকরণে ও জীবনমান উন্নয়নে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার বিষয়টি অধিক গুরুত্ব পাবে- সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ যেন এ বিষয়ে পিছ পা না হন।

লেখক : কথাসাহিত্যিক, অনুবাদক ও গবেষক

[সাক্ষরতা বুলেটিন, শ্রাবণ ১৪১৬, জুলাই ২০০৯]